Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 28–40
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

বাংলার ধর্মীয় সংস্কৃতিতে কয়েকটি বৈষ্ণব আখড়া

অসীম বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক,
ইতিহাস বিভাগ, সুবর্ণরেখা মহাবিদ্যালয়
ই-মেইল: sriashim.biswas@gmail.com

Keyword
আখড়া, শ্রীপাট, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম, তীর্থকেন্দ্র, বৈষ্ণবসমাজ, খড়দহ, শ্রীখন্ড, চাকুন্দি, কুলিনগ্রাম, সমাজবাড়ি

Abstract
বাংলার ধর্মীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের উত্থান একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাংলা তথা ভারতবর্ষের সংস্কৃতি এমনকি বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতিতে বৈষ্ণব ধর্মের অবদান অনস্বীকার্য। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বৈষ্ণব ধর্ম আজ বিশ্ব মানবতার ধর্মে পরিণত হয়েছে যার সৌজন্যে তিনি হলেন নদিয়ার-চাঁদ নিমাই; মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁর হাত ধরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বাংলার গণ্ডি অতিক্রম করে বাংলার বাইরে অপরাপর ভারতীয় ভূখণ্ডে এবং বিদেশে এই ধর্মের প্রসার ঘটেছে। শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের পরবর্তীকালে তাঁর অনুচর-পরিকর-সহচর-শিষ্য-প্রশিষ্যদের সহযোগিতায় 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম' তথা 'ভারতীয় বৈষ্ণবধর্ম' নতুনরূপে নবযুগে উত্তীর্ণ হয়েছে। আর তাই, এক্ষেত্রে দেখা যায় শ্রীচৈতন্যের সমকালীন সময়ে এবং পরবর্তীকালে বাংলা সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ধর্মীয় নেতাকে কেন্দ্র করে বা কোনো বিশেষ স্থানকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণবীয় আখড়া গড়ে উঠেছিল সারা ভারতবর্ষব্যাপী। এই আখড়াগুলিকে কেন্দ্র করেই বৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত ও প্রসারিত হয়েছিল বিভিন্ন প্রান্তে। বাংলার ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতিতে এটি ছিল একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকের শুরু থেকে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। আজও এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। তবে প্রধারণত ষোড়শ শতক এবং সপ্তদশ শতকেই বৈষ্ণবীয় আখড়ার উত্থান, বিস্তার ও ধ্বংসের সুবর্ণযুগ ছিল বলে মনে হয়। শ্রীচৈতন্যদেব জীবিত থাকাকালীন সময়েই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে বিভেদ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর মৃত্যুর পর এই বিভেদ আরও চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। তৎকালীন সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যন্তরেই নেতৃত্বের অনৈক্যের ফলে গড়ে উঠতে থাকে বিভিন্ন দল-উপদল, শাখা-উপশাখা সম্প্রদায় ও গোষ্ঠী। আর সেজন্যই বিভিন্ন ধর্মীয়নেতা ভিন্ন ভিন্ন তীর্থকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন তীর্থকেন্দ্র বা শ্রীপাট বা আখড়া গড়ে তুলতে থাকেন। আবার এই আখড়াগুলিকে কেন্দ্র করেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সমান্তরালে বিভিন্ন অনুসারী ধর্মীয় গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। যারা পরবর্তী শতকগুলিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। আমি, আমার এই গবেষণা নিবন্ধে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে ওঠা কয়েকটি বৈষ্ণব আখড়া বা শ্রীপাট সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

Discussion

বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও প্রসারের ফলশ্রুতিতে বাংলা তথা ভারতবর্ষের নানা স্থানে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য বৈষ্ণব শ্রীপাট-তীর্থ-আখড়া-সমাজ। বৈষ্ণবধর্মের সাধন-ভজন, বৈষ্ণব দর্শন চর্চা, সামাজিক রীতিনীতি ও নাম-সংকীর্তনে মুখরিত হয়ে ওঠার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু এই স্থানগুলি। অনতিকাল পরেই এই স্থানগুলি বৈষ্ণবদের ধর্মচর্চার পরম ও প্রধান প্রধান তীর্থে পরিণত হয়। নদিয়া সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের এই তীর্থকেন্দ্রগুলিকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণবধর্ম বিকশিত হয়েছিল এবং বর্তমান কালে তার অস্তিত্ব লক্ষণীয়ভাবে লক্ষ্য করা যায়। তবে একথাও ঠিক যে, আঠারো শতক থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের স্রোত ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থেকেছে এবং পরিশেষে একটা সময় তার পূর্বের গৌরব হারিয়ে ফেলেছিল। পরবর্তীকালে এর থেকে মুক্ত হয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের জনপ্রিয়তা আবার বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন মঠ, মন্দির ও আখড়া তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। বাংলা সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের এই কেন্দ্রগুলি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের পূর্ব গৌরবের স্মৃতি বহন করে আসছে দীর্ঘকাল ধরে। বৈষ্ণব ধর্মের বিভিন্ন নেতৃত্ব এবং বাবাজিরা বিভিন্ন জায়গায় আখড়া তৈরি করে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।

সংস্কৃত 'অক্ষবাট' শব্দ থেকে আখড়া শব্দটি এসেছে। যার অর্থ 'মল্ল' বা 'ক্রীড়াভূমি'। ছোটো ছোটো ধর্ম সম্প্রদায়ের আশ্রম বা মঠ হল এই আখড়া। যাত্রা গানের ক্ষেত্রে শব্দটি ব্যবহৃত হলেও এক্ষেত্রে ধর্মসম্প্রদায়ের আশ্রম বলতে আখড়াকে বোঝানো হয়েছে। আশ্রম এবং আখড়ার প্রধান পার্থক্য এই যে, মঠের উপর তাদের মহান্তদের সম্পূর্ণ অধিকার থাকে কিন্তু আখড়াতে সেরূপ কোনো আধিপত্য থাকে না। অনেক দশনামি সন্ন্যাসী একত্র মিলিত হয়ে আখড়া প্রস্তুত করেন এবং সেখানে তাঁদের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে। আখড়ার মহন্ত তাঁদের মত গ্রহণ ব্যতিরেকে কিছুই করতে পারেন না। আবার দন্ডীরা অর্থাৎ যারা দন্ড কমন্ডলু সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণ করেন তারাই কেবলমাত্র মঠের অন্তর্গত হয়ে থাকে। কিন্তু সন্ন্যাসীরা মঠ ও আখড়া উভয়েরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে।[১] আজ থেকে একশো বছর আগে বাংলা ১৩২০ সনের ২৯ শে মাঘ নবদ্বীপধামে অনুষ্ঠিত এক মহাসম্মেলনে বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উল্লেখযোগ্য প্রায় ৩০০ মঠ ও মন্দির এবং আখড়ার প্রায় ৭০০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই উল্লেখযোগ্য ৩০০ মঠ-মন্দির এবং আখড়ার অধিকাংশই আজ বিলুপ্ত। তবুও শতাধিক মঠ, মন্দির ও আখড়ার অস্তিত্ব এখনো পাওয়া যায়। যে সমস্ত জায়গার প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে যোগদান করেছিল তার মধ্যে কয়েকটি কেন্দ্র হল: কলিকাতা, খড়দহ, মাড়গ্রাম, মানকর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, কানাইডাঙ্গা, সদপুর, আউগ্রাম, কাটোয়া, শীতলগ্রাম, শ্রীধাম নবদ্বীপ, মহাপ্রভু বাটীর গোস্বামীবৃন্দ ও ভক্তবর্গ, খড়িখালি, গৌরবাজার, বোলকুন্ডা, শ্রীপুর, বকসা, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, হরিহরডাঙ্গা, পুরুলিয়া, বাদুরা, পুরন্দরপুর, বুজন, ভদ্রপুর, আড়িয়াল ঢাকা, সাকুয়া, হুগলি, হাবড়া, কৃষ্ণনগর হরিট, শ্রীখন্ড, আবাডাঙ্গা, বাঘনাপাড়া, কল্যাণপুর, জিরাট, ভাজনঘাট, বলাগড়, মালিপাড়া, খানাকুল, শীধলগ্রাম, পাঁচড়া, কুলিনগ্রাম, শ্রীরূপ, দক্ষিণখন্ড, ফরাসডাঙ্গা, নবগ্রাম, হিয়াপুর, চিরকুন্ডা, গোপীবল্লভপুর, তোলনগ্রাম, সাদিপুর, চাকটা, বাউপুর, জঙ্গিপুর, কুশুর, গোকর্ণ, ময়না ডাল, ভরতপুর, ইসলামপুর, দোপুকুরিয়া, গৌরীপুর, শক্তিপুর, শ্রীধাম শ্রীক্ষেত্র, মায়াপুর, ভান্ডারিবন, সাজিগ্রাম, বসিরহাট, বর্ধমান, একচাকা, কামারপাড়া, চন্দননগর, গড়বাড়ি, হৃদয়রামপুর, চুঁচুড়া, খামারপাড়া, নবাবগঞ্জ, ঘুষীলালবাগ, লোহাদহ, রায়রপুর, সাবপুর, ব্যাটরী, কাকোড়া, দেনুড়, বালেশ্বর, মানশ্রী, দেবগ্রাম, ভাণ্ডারহাটি, মির্জাপুর, কুলটি, দুর্গাপুর, কুমিল্লা, গায়ঘর, অম্বিকা, মহেশপুশ, গোবিন্দপুর, রাজবাড়ি, লৌহজং, বিনোদপুর, পাবনা, রুইসনপুর, গণকহাট, সাতপাড়া, কৃষ্ণনগর-গোয়াড়ী, যশোহর, কালীগঞ্জ, নয়ানগর, গয়া, বরলা, নাগরপুর, বীরচন্দ্রপুর, গোয়ালজান, ভদ্রপুর প্রভৃতি।[২] বর্ধমানের শ্রীখন্ড থেকে সেদিনকার সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন গৌরগুণানন্দ ঠাকুর এবং 'শ্রীচৈতন্যদায়িনীসভার'র সম্পাদক দ্বারিকানাথ ঠাকুর সহ বিভিন্ন প্রতিনিধিবর্গ। এর থেকে বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মঠ, মন্দির ও আখড়ার পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ ষোড়শ শতকের প্রবহমান ধারা পরবর্তী কয়েকটি শতক ধরে চলছিল।

যে সমস্ত মঠ-মন্দির-আশ্রম-আখড়া বৈষ্ণবীয় সমাজে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল সেগুলি সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন। প্রাক-শ্রীচৈতন্যযুগ, সমকালীন এবং তাঁর পরবর্তীকালীন সময়ে গড়ে ওঠা

বিভিন্ন বৈষ্ণবীয় আখড়া ও আশ্রম ভক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, সে বিষয়ে আমাদের অবহিত হওয়া দরকার। এ বিষয়ে আমরা বাংলার ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতিতে যে সমস্ত বৈষ্ণবীয় শ্রীপাটগুলি বিভিন্ন ভূমিকা পালন করেছিল সেগুলির মধ্যে কয়েকটি সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

পালপাড়া বৈষ্ণব শ্রীপাট : বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম সংগঠক ও প্রচারক শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দ্বাদশ সহচরের অন্যতম দ্বাদশ-গোপাল মহেশ পন্ডিতের শ্রীপাট বা আখড়া ছিল পালপাড়া। এটি পূর্ব রেলপথের শিয়ালদহ-রানাঘাট শাখার চাকদহ স্টেশন থেকে দু'মাইলের অন্তর্বর্তী স্থলে ভাগীরথীর পাড়ে অবস্থিত। পূর্বে এই আখড়া বা শ্রীপাটটি মণিপুরে অবস্থিত ছিল। গঙ্গা ভাঙনের জন্য এই শ্রীপাটটি পালপাড়ায় স্থানান্তরিত হয়। মহেষ পন্ডিতের সেবিতো শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ বিগ্রহটি এই তীর্থ কেন্দ্রের আকর্ষণীয় বিগ্রহ। ভক্তকুল এবং বৈষ্ণব সমাজে এই কেন্দ্রটি অতি দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। নিত্যানন্দ প্রভুর সংসার আশ্রমের কিছুকাল পরেই মহেশ পণ্ডিত তাঁর অগ্রজ জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট যশড়া গ্রামের (যা ছিল পালপাড়া সন্নিকটে) কিছু দূরে গঙ্গা তীরে 'সুখসাগর' নামক গ্রামে স্থাপন করেন এবং সেখানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে জগদীশ পণ্ডিত মারা গেলে আনুমানিক ১২৫৭ সনে পালপাড়ায় তদানীন্তন জমিদার নবকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীপাটের সেবাইত মহাশয়কে অনুরোধ করে পালপাড়ায় সকল বিগ্রহ নিয়ে আসেন এবং সেখানে মন্দির নির্মাণ করে আখড়া স্থাপন করেন। সেই সময় থেকেই পালপাড়া গ্রাম মহেশ পন্ডিতের শ্রীপাট বলে গণ্য হয়ে আসছে। তৎকালীন সময়ে পাল পাড়ার প্রায় ভেতর দিয়েই ভাগীরথী নদী প্রবাহমান ছিল। তার জ্বলন্ত প্রমাণ আজও সেখানে একটি বিরাট খালের অবস্থান। খালটি 'বাঘের বিল' নামে সর্বজন পরিচিত।[৩] এই বিলটি আজও গঙ্গার পূণ্যধারার মতো রূপে প্রবহমান অবস্থায় জীবন্ত হয়ে আছে। আর এই বিলের কাছে অবস্থিত পালপাড়া আখড়াটি তাই বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই আখড়াটিকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণবীয় বিভিন্ন আচার বিচার ও ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করা হয়ে থাকে।

অম্বিকা-কালনা : গঙ্গা বা ভাগীরথী নদী থেকে আড়াই কিলোমিটার দূরে অম্বিকা-কালনা বৈষ্ণব শ্রীপাটটি অবস্থিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে, এটির অবস্থান নবদ্বীপের সন্নিকটে বর্ধমানের অম্বিকা কালনাতে। স্থানটির প্রাচীন নাম অম্বুয়া মুলক। পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া-কাটোয়া বিভাগের বর্ধমান জেলায় কালনা স্টেশনটি অবস্থিত। ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচলে যাত্রাপথে বৈষ্ণব পন্ডিত সূর্যদাস সরখেলের সঙ্গে দেখা করতে এই আশ্রমে এসেছিলেন। এই আখড়ার চারপাশে বকুলগাছে সমৃদ্ধ ছিল। তার মধ্যে একটি বিখ্যাত তেঁতুল গাছ ছিল, তার তলায় শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সূর্যদাসের সাক্ষাৎ হয়েছিল। শ্রীচৈতন্যের পদধুলিধন্য এই আখড়াটি তাই বৈষ্ণব সমাজে অতি আকর্ষণীয়। উক্ত তেঁতুল গাছটি আজও বর্তমান আছে। সূর্যদাস ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বাদশ গোপালের অন্যতম গোপাল। এই আখড়াটিতে অন্যতম বৈষ্ণব সাধক শিরোমনি ভগবান দাস বাবাজি থাকতেন। বাবাজির সঙ্গে দেখা করার জন্য ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বর থেকে অম্বিকা কালনাতে এসেছিলেন। সেখানে রামকৃষ্ণ এবং বাবাজির মধ্যে সাক্ষাৎ হয়েছিল। এই দুই মহাপুরুষের মহামিলন স্থলটি 'ব্রহ্মমন্দির' নামে খ্যাত। এই আখড়াতে নিতাই, গৌর ও শ্যামসুন্দরের বিগ্রহ আছে। সেই সঙ্গে তেঁতুল গাছের নিচে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদচিহ্ন যুক্ত একটি পাথর খোদিত আছে। এই শ্রীপাটের একটি মন্দিরে শ্রীচৈতন্যের দারুমূর্তি খোদিত আছে। এই আশ্রমেই প্রভু নিত্যানন্দের সঙ্গে সূর্যদাস সরখেলের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবার বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল এবং সেই বিবাহ স্থলটি বৈষ্ণব সমাজে একটি অন্যতম দর্শনীয় ও আকর্ষণীয় স্থান হিসাবে আজও পরিগণিত। বর্তমানে এই আশ্রমটি 'গৌরীদাস পন্ডিতের আশ্রম' নামে অভিহিত। নদিয়ার মুড়িগাছার সন্নিকটে বাহিরগাছি গ্রাম তার নিকটে শালিগ্রাম অবস্থিত। সেই শালিগ্রাম থেকে গৌরিদাস পন্ডিত অম্বিকা কালনায় এসে বসতি করে তুলেছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল বিমলা দেবী। গৌরীদাসের দুই পুত্র যথাক্রমে, বলরাম দাস ও রঘুনাথ দাস।[৪] এই আখড়াটি তাই বৈষ্ণব সমাজের অন্যতম পবিত্র 'তীর্থভূমিরূপে' পরিচিতি লাভ করেছে।

'শ্রীচৈতন্য ডোবা': ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত একটি বৈষ্ণব অধ্যুষিত গ্রাম ছিল কুমারহট্ট। কুমারহট্টের সংযুক্ত এলাকা ছিল হালিশহর। শিয়ালদহ রেলপথ ধরে রানাঘাটের দিকে যেতে নৈহাটি অথবা কাঁচরাপাড়া স্টেশনে নেমে বাস বা অন্য কোনো যানবাহনে হালিশহরের 'চৈতন্যডোবা' আখড়াতে পৌঁছানো যায়। কুমারহাটের বর্তমান নাম হালিশহর এবং পূর্ব রেলওয়ে শিয়ালদহ শাখার একটি অন্যতম রেল স্টেশন। এর কাছেই 'চৈতন্যডোবা' শ্রীপাটটি অবস্থিত।[৫] এখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জন্ম হয়েছিল। সেই কারণে এই তীর্থকেন্দ্রটি বৈষ্ণব সমাজে অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ। আজও ইতিহাসের সাক্ষী হিসাবে এই অঞ্চলের 'চৈতন্যডোবা' আখড়াটি বিখ্যাত হয়ে আছে।

বুধরি : বুধুরি বা বুধরি মুর্শিদাবাদ জেলার একটি বিখ্যাত বৈষ্ণব আখড়া। এই শ্রীপাটকে অনেকে বুধোড় এবং তোলিয়াবুধরিও বলে থাকেন। বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধক গোবিন্দ কবিরাজের স্থাপিত গোপালবিগ্রহ ও তাঁর পুত্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নিতাই বিগ্রহ এখানকার আকর্ষণীয় বস্তু। এখানে 'শ্রীগৌরাঙ্গ বাড়ি' নামে একটি আখড়া ছিল। প্রতিবছর গোবিন্দ কবিরাজের আবির্ভাব দিবসে অর্থাৎ ফাল্গুনী শুক্লা ত্রয়োদশ তিথিতে বছরে একবারমাত্রই এখানে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সে কারণে এই আখড়াটি বৈষ্ণব সমাজে অধিক সমাদৃত।

শ্রীখন্ড : মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য পরিকর তথা পার্ষদ বৈষ্ণব অধিকর্তা নরহরি সরকার ঠাকুর ও তাঁর ভ্রাতা মুকুন্দ সরকারের শ্রীপাট শ্রীখন্ড। এঁরা দুজনেই ছিলেন সুপন্ডিত ও ভক্তিরস শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ। শ্রীচৈতন্যের অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন এঁরা দুজন। দুজনেই শ্রীচৈতন্যের সাথে নীলাচলে গিয়েছিলেন। এঁরা শ্রীচৈতন্যের সাত সম্প্রদায়ের চৌদ্দ মাদল কীর্তনের অংশীদার ছিলেন। নরহরি সরকার ছিলেন 'গৌরনগরবাদ' তত্ত্বের প্রবর্তক। এই শ্রীপাটের আকর্ষণ পঞ্চবিগ্রহ মন্দিরের প্রধান শোভা। পঞ্চবিগ্রহগুলি হলো: গোপীনাথ, শ্যামরায়, মদনগোপাল, গোবিন্দজী ও মদনমোহন বিগ্রহ। এই বিগ্রহগুলি পরস্পর পাশাপাশি সুসজ্জিত আসনে উপবিষ্ট আছে। বৈষ্ণব সাধক মুকুন্দ সরকারের পুত্র রঘুনন্দন সরকার ছিলেন 'অষ্টরস সিদ্ধ' বৈষ্ণব সাধক। তাঁর আসনও এই মন্দিরে পঞ্চম বিগ্রহের পাশে অবস্থিত আছে। প্রতি পৌষ মাসে তিরোভাব উৎসব পালিত হয়ে থাকে এখানে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এখানে কয়েকবার এসেছিলেন। তাই দেখা যায় যে, নিত্যানন্দ পদধূলি ধন্য এই শ্রীপাট বা আখড়াটি বৈষ্ণব সমাজে অধিক আকর্ষণীয়।
নদিয়া গৌরব তথা নবগৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রবক্তা 'অচিন্ত্য-ভেদা-অভেদ' তত্ত্বের উদগাতা মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মকে অবলম্বন করে এখানে সৃষ্টি হয়েছিল নতুন একটি কীর্তন ঘরানা। যেটি 'মনোহরশাহী ঘরানা' নামে পরিচিত।[৬] বাংলা কীর্তনের প্রচলিত ধারাগুলির মধ্যে অন্যতম এই মনোহরশাহী ঘরানা। এর পাশাপাশি গরানহাটি, রেনেটি, মন্দারনি, ঝাড়খন্ডি, ময়নাডাল ধারা নামেও বিভিন্ন ঘরানার কীর্তন প্রচলিত বৈষ্ণব সমাজে। তবে, ময়না ডাল কীর্তন ঘরানা প্রকৃতপক্ষে মনোহরশাহী ঘরানার একটি রুপভেদ। বর্ধমানস্থিত এই শ্রীখন্ড শ্রীপাট অন্তর্বর্তী মনোহরশাই পরগনায় এই বিশেষ কীর্তন ঘরানার উদ্ভব হয়েছিল বলে মনে করা হয়। তবে অনেকে মনে করেন, শ্রীখন্ডের কাছে কান্দরা নিবাসী বংশীবদন ঠাকুর এবং তাঁর সঙ্গীত গুরু আউলি মনোহর দাস এই ঢং এর কীর্তনের উদ্ভাবক। আবার কেউ কেউ মনে করেন, বৈষ্ণব ধর্মগুরু শ্রীনিবাস আচার্য এই ঘরানার কীর্তনের উদ্ভাবক। বিতর্ক যাই থাকুক না কেন, শ্রীখন্ড আখড়াকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব সমাজে যে একটি নতুন কীর্তন গায়নরীতির উদ্ভাবন ঘটেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কাটোয়া-আউরিয়া : শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-আশ্রম গুরু মহাত্মা কেশব ভারতীর বাস্তুভিটা ছিল বৈষ্ণব সমাজের অন্যতম শ্রীপাট কাটোয়া-আউরিয়া। ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এখানে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং গুরু কেশব ভারতী শ্রীচৈতন্যের নামকরণ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। মহাত্মা কেশব ভারতী আধ্যাত্মিক মার্গের সহজপথ দেখিয়েছিলেন শ্রীচৈতন্যকে। এখানে, দীক্ষা গ্রহণের স্থান এবং শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ প্রভুর বিগ্রহ

আছে। মঠটাতে কেশব ভারতীর সমাধি, গুরু এবং শিষ্যের পায়ের ছাপ আজও এখানে আছে। কাটোয়া-অঙ্গারিয়া একটি মহান বৈষ্ণব তীর্থ। এখানে একটি মন্দির ও আখড়া ছিল। এই স্থানেই শ্রীনিবাস আচার্য ও নরোত্তম দাস ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল দাস গদাধরের সঙ্গে।[৭] গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের প্রথম সম্মেলন এই কাটোয়া আউরিয়ার অঙ্গারিয়াতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর আরও যে দু'টি বৈষ্ণব মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেগুলির সম্মেলনস্থল ছিল শ্রীখন্ড ও খেতুরি।

খড়দহ : খড়দহ বা খড়দা শ্রীপাটটি উত্তর চব্বিশ পরগনায় গঙ্গার তীরে অবস্থিত। এই আখড়াটি মন্দিরময়। এটি প্রভু নিত্যানন্দর বিহারভূমি বলেও সর্বজনবিদিত। এই শ্রীপাটের মন্দিরের শিখর দেশে একটি ভগ্ন ইটনির্মিত লিপি আছে। এই মন্দিরের কুলুঙ্গিতে দারুময় নিতাই-গৌর বিগ্রহ, অষ্টধাতুর তৈরি রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ ও কয়েকটি সুন্দর শালগ্রাম আছে। এখানে নিত্য বিগ্রহ সেবা, বৈষ্ণব সেবা, নাম-সংকীর্তন, মহোৎসব ও ভাগবত পাঠ ছিল সংসারী নিতাইচাঁদের গৃহে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম। বহু ভক্ত খড়দহ শ্রীপাটে এসে বসবাস করতে থাকেন ষোড়শ শতক থেকে। এভাবেই বৈষ্ণব প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে খড়দহ বৈষ্ণবধর্মের প্রধান তীর্থে পরিণত হয়েছিল। সে সময়ে শ্রীশ্যামসুন্দরের বারো মাসে তেরো পার্বণ হত। তার মধ্যে ফুলদোল ও রাসযাত্রা প্রধান ছিল। প্রাচীন রাসমন্দিরটি গঙ্গার ধারে লালুপালের বাঁধা ঘাটের উপরে রাস্তার পূর্ব দিকে ছিল। ১২৮৪ বঙ্গাব্দে গোস্বামী প্রভুদের মধ্যে গৃহবিবাদ হওয়াতে ওই স্থানে বিগ্রহের রাসযাত্রা বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে খড়দহ খেয়াঘাটের পূর্বদিকে নতুন রাসমন্দির নির্মিত হয়। শ্রীশ্যামসুন্দর সপ্তদশ রত্ন বিশিষ্ট রাসমঞ্চের আজ আর কোনো অস্তিত্ব মেলেনা।[৮]

আদি সপ্তগ্রাম : নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য দ্বাদশ গোপালের একতম গোপাল উদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাট ছিল আদি সপ্তগ্রাম। প্রিয়ব্রত রাজার অগ্নিদ্র, মেধাতিথি, বপুমান, জ্যোতিষ্মান, দুতিমান, সবন, ডব্য—এই সাতজন পুত্র সর্বত্যাগী হয়ে এই স্থানে এসে সাধনা করেছিলেন। তাঁদের কঠোর তপস্যার কারণে এই স্থানের নাম হয় সপ্তগ্রাম। গঙ্গা যমুনা সরস্বতী বিধৌত মহাতীর্থ ত্রিবেণী সপ্তগ্রামের অন্তর্গত। তখন সপ্তগ্রামের রাজা ছিলেন হিরণ্য ও গোবর্ধন দাস। গোবর্ধন এর পুত্র রঘুনাথ দাস গোস্বামী ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য ও অপ্সরা সমান পত্নীকে পরিত্যাগ করে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এই আদি সপ্তগ্রাম শ্রীপাটে। ১৫৯২ খ্রিস্টাব্দে সপ্তগ্রাম পাঠানরা অধিকার করে সাতটি গ্রামের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছিলেন। এই সাতটি গ্রাম হল— বংশীহাটি, শিবপুর, বাসুদেবপুর, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর, শঙ্কনগর ও সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রাম বলতে এই সাতটি গ্রামকেই বোঝায়। পরবর্তীকালে একটি অন্যতম বাণিজ্যিক বন্দর কেন্দ্র হিসেবে সপ্তগ্রামের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে এখানে এই শ্রীপাট রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ‘উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর সমিতি' গঠিত হয় এবং সেই সমিতির উদ্যোগে প্রতিবছর পৌষ মাসে এখানে একটি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।[৯] এই আখড়াটি বৈষ্ণব সমাজে যথেষ্ট সমাদর অর্জন করেছে।

রামকেলি : মালদহ জেলার মালদহ শহর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে রামকেলির অবস্থান। গৌড়ের কাছে এর অবস্থান। এটি একদা গৌড়ের রাজধানী ছিল। রামকেলির উত্তরে সনাতন দীঘি, পশ্চিম দিকে সনাতন গোস্বামীর বাড়ি ছিল। এখন সেই বাড়ি ‘বড়বাড়ি’ নামে পরিচিত। রামকেলি হল শ্রীরূপ সনাতন বল্লভ ও শ্রীজীব কেশব ছত্রীর শ্রীপাট। এখানকার মন্দিরটি সনাতন গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত ‘শ্রীমদনমোহন মন্দির' নামে পরিচিত। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মালদহের রামকেলিতে এসে যে স্থানে বিশ্রাম করেছিলেন, সেই স্থানের প্রাচীন তমাল ও কেলিকদম্ব বৃক্ষ আজও রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। সেই বৃক্ষতল সংলগ্ন তৈরি উচ্চ এক বেদিতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীচরণচিহ্ন যুক্ত একখানা শিলাখণ্ডও বর্তমান আছে। তারই পাশে একটি মন্দিরে নিতাই-গৌর ও অদ্বৈত প্রভুর মূর্তি বিরাজমান আছে। এই আখড়াটি তাই চৈতন্যধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র বলে বিবেচিত।

বরাহনগর : বরাহ নামে জনৈক সিদ্ধপুরুষের নাম থেকে বরাহনগর স্থানটির নামকরণ হয়েছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, মহারাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন বরাহমিহির এই স্থানের রাজা ছিলেন। ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে বৃন্দাবন যাত্রার উদ্দেশ্যে মহাপ্রভু গৌড়ে ভ্রমণ করেছিলেন। সে সময়ে কানাইয়ের নাট্যশালা পর্যন্ত গিয়ে বৃন্দাবন যাত্রা ভঙ্গ করে প্রত্যাবর্তনের পথে পানিহাটি হয়ে তিনি বরাহনগরে এসেছিলেন। সেখানে প্রভু রঘুনাথ বিপ্রের অতি সুন্দর শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনে তাঁকে 'ভাগবত আচার্য' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব। এই শ্রীপাটের সঙ্গে বাগবাজার ও খড়দহ শ্রীপাটের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই আখড়াটি শ্রীচৈতন্যোত্তর কালে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিল।

চাকুন্দি : গঙ্গার গতিপথ পরিবর্তনের ফলে একদা বর্ধমান জেলার চাকুন্দি এখন নদিয়া জেলার অভ্যন্তরে নদীর ধারে অবস্থিত। বর্ধমান-কাটোয়া রেলপথে দাঁইহাট স্টেশন থেকে কিছুটা দূরে অগ্রদ্বীপের তিন মাইল উত্তরে চাকুন্দি শ্রীপাটটি অবস্থিত। চাকুন্দি ছিল শ্রীনিবাস আচার্যের আবির্ভাব স্থান। শ্রীনিবাসের পিতা গঙ্গাধর ভট্টাচার্য বা শ্রীচৈতন্য দাশের শ্রীপাট এই চাকুন্দি।[১০] এই চাকুন্দি শ্রীপাটে শ্রীনিবাস আচার্যের সমাধিক্ষেত্র ছিল, আজ সেই সমাধিক্ষেত্র নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। বর্তমানে চাকুন্দির শ্রীপাট ও মন্দিরটির অবস্থা খুবই শোচনীয়। এই শ্রীপাটে একটি চালাঘরের অভ্যন্তরে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ এবং নিতাই-গৌরের মূর্তি; কেবলমাত্র সকাল ও সন্ধ্যায় পুজো দেওয়া হয়। এই অবক্ষয়ের জন্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় অপেক্ষা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের নেতৃত্বের সাংগঠনিক দুর্বলতা অধিক পরিমাণে দায়ি ছিল।

কুমারপাড়া শ্রীপাট : বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য প্রাচীন মন্দির ও আখড়া ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার 'শ্রীরাধামাধবের মন্দির' ও 'কুমারপাড়া আখড়া'। প্রকাশ শ্রীজীব গোস্বামীর আদেশে তাঁর প্রশিষ্য বংশীবদন গোস্বামী প্রায় ৪০০ বছর আগে ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে বৃন্দাবন থেকে এই বিদ্রোহ নিয়ে এসে এখানে গঙ্গা নদীর তীরে মন্দিরটি নির্মাণ ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দশ কাঠা জমির ওপর মূল মন্দিরটি নির্মিত হলেও এই মন্দিরের ও আখড়ার সম্পত্তি বলতে আরো সাত একর বা প্রায় ২১ বিঘা পরিমাণ জমি রয়েছে। উক্ত জমি এই আখড়ার চাষযোগ্য জমি, যা চাষ করে আখড়ার প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান হয়।

সাধকবাগের বড় আখড়া ও মঠ : মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জ এর বুধরির নিকটবর্তী সাধকভাগে মস্তরাম সাধুর বিরাট আখড়াটি অবস্থিত। মস্তরাম সাধুর প্রকৃত নাম ছিল সদানন্দ। তিনি শারীরিক ও যৌগিক শক্তির জন্য সুপ্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। সাধকবাগ মুর্শিদাবাদ শহর থেকে ১৩/১৪ কিলোমিটার দূরে উত্তরে গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। অনুমান করা হয় যে, অষ্টাদশ শতকে সিরাজদৌলার রাজত্বকালে ওই আখড়াটি স্থাপিত ছিল। মস্তরাম আটলিয়া এই আখড়ার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সেজন্য সাধারণ মানুষেরা এটিকে 'মস্তরাম বাবাজির আখড়া' বলে থাকেন।

বালুচর-গাম্ভিলা শ্রীগুরুপাট : ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের নিকটে বালুচর-গম্ভীলা শ্রীগুরুপাটটি অবস্থিত। এই শ্রীপাটটি আসলে বৈষ্ণব পন্ডিত ও ধর্ম প্রচারক শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুরের বাস্তবভিটা। এই তীর্থ বা আখড়াটি 'বড় গোবিন্দের বাড়ি' বা 'বড় ঠাকুরের বাড়ি' নামেও সমাধিক পরিচিত। এই বাড়িতেই শ্রীরাধাগোবিন্দ জিউর মন্দির ও বিগ্রহ আছে। প্রতিবছর ফাল্গুনের দোলমেলা এবং শ্রাবণের ঝুলন উৎসব এখানে মহামেলা অনুষ্ঠিত হয়। গাম্ভীলার বর্তমান নাম জিয়াগঞ্জ। নরোত্তম দাস ঠাকুরের শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর শ্রীপাটও এটি। তিনি দুটি বিগ্রহসেবা করতেন। এগুলি হল শ্রীশ্রীগোবিন্দ বা গোপীনাথ এবং শ্রীরাধারমণ বিগ্রহ। শ্রীশ্রীরাধারমণ বিগ্রহের পদতলে 'গঙ্গারাম দাস' নামটি খোদিত আছে। এই শ্রীপাটের বড় এবং ছোট গোস্বামী বাড়ি বর্তমানেও আছে।[১১] মণিপুরের রাজা ভাগ্য চন্দ্র সিংহ (মেইডিংশু চিংথাহুমরা) নরোত্তম দাস ঠাকুরের শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং বৈষ্ণব ধর্মকে মণিপুরের রাজধর্ম বলে স্বীকার করেন। ১৭৬৩- ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে শেষ বয়সে রাজ্যপাট ছেড়ে দিয়ে ভাগ্যচন্দ্র তাঁর কন্যা ও স্ত্রী সহ নবদ্বীপ ও বালুচর গম্ভিলা শ্রীপাটে রাধাগোবিন্দ আরাধনা করার উদ্দেশ্যে চলে আসেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ তাঁকে 'রাজর্ষি' সম্মানে ভূষিত করেন। সেই সময় বাংলার মুসলমান রাজত্বে যখন মূর্তি পূজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল; গুহা খনন করে আড়ালে আবডালে মূর্তির পূজা-অর্চনা করতে হতো, তখন তিনি প্রকাশ্যে মূর্তি পূজার পুনঃপ্রচলন ঘটান। **১৭৯৯** খ্রিস্টাব্দে এখানেই রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্র দেহত্যাগ করেন। তাঁর সমাধিও এখানেই আছে। ভাগ্যচন্দ্র ও তাঁর কন্যা বিশ্ববতী মঞ্জুরী (সিজা লাইওবি) **১৭৮৯** খ্রিস্টাব্দে নবদ্বীপে 'অনু মহাপ্রভু' ও 'নবদ্বীপ চন্দ্রের' বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তৎকালীন নদিয়ার শাসক রাজা ঈশ্বরচন্দ্র (মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র) ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গের পূজার অনুমতি দিয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে নদিয়ারাজ শাক্ত-ধর্মাবলম্বী হওয়ার ফলে বৈষ্ণবদের ওপর কঠোর বিধি নিষেধ আরোপিত হয়েছিল। সে ক্ষেত্রে ভাগ্যচন্দ্র নদিয়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্রকে বুঝিয়ে সাজিয়ে শ্রীচৈতন্যদেবকে দেবতা রূপে গণ্য করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এবং তারপর থেকেই শ্রীচৈতন্যদেব দেবতা রূপে পূজিত হতে থাকেন। মণিপুররাজ ভাগ্যচন্দ্র নবদ্বীপের যে অঞ্চলে বসবাস করতেন সেই স্থানটি বর্তমানে মণিপুর রোড পাড়া নামে পরিচিত।[১২]

মাধবীলতা : বৈষ্ণব সমাজের দুজন বিতর্কিত চরিত্র জগাই ও মাধাই 'মাতাল-ভাতৃদ্বয়' নামে সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁদের বসতবাটি ছিল মাধবীলতা শ্রীপাট।[১৩] এই আখড়াটির নিকটেই একদা নিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস ঠাকুরকে অপমান করেছিল তারা। যদিও পরবর্তীকালে এরা পরম বৈষ্ণব ভক্ত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তাদের বসতবাটি তাই একটি প্রধান বৈষ্ণব তীর্থ বা আখড়ায় পরিণত হয়েছিল স্বল্প দিনের মধ্যেই। নবদ্বীপের ত্রাস এই খুড়তুতো ও জেঠতুতো ভাই জগন্নাথ বা জগাই এবং মাধব বা মাধাই ভ্রাতৃদ্বয়কে প্রেম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন প্রভু নিত্যানন্দ ও ঠাকুর হরিদাস। এটি সম্ভব হয়েছিল মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সহচর্য ও অনুপ্রেরণায়। জগাইয়ের পিতা রঘুনাথ রায় এবং মাধাইয়ের পিতা ছিলেন জনার্ধন রায়। এদের ঠাকুরদা শুভঙ্কর রায় ছিলেন তৎকালীন নবদ্বীপ সন্নিকটবর্তী স্থানের জমিদার। পরবর্তীকালে এই চোর, ডাকাত, লুণ্ঠনকারী, মাদকাসক্ত দস্যুরাও কৃষ্ণনামে বিভোর হয়েছিলেন। এখানেই চৈতন্যধর্মের বাস্তবতা। শ্রীচৈতন্যদেবই পেরেছিলেন প্রেমভক্তি প্রচার করে মানুষের ভালবাসা অর্জন করতে। এবং সেই প্রেমভক্তির মাধ্যমেই মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। এখানেই শ্রীচৈতন্যদেব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের চরম সার্থকতা। এরপর থেকে নবদ্বীপ অঞ্চলে শান্তি ফিরে আসে। নিত্যানন্দ প্রভু ভাঙা কলসির টুকরোর আঘাতে রক্তাক্ত হলেও তাঁদের দুজনকে বুকে টেনে নিয়ে পরম ভক্তে পরিণত করেছিলেন। এরকম দৃষ্টান্ত ধর্মীয় ইতিহাসে খুব কমই মেলে।

জাজিগ্রাম : বর্তমানে বর্ধমান জেলার নদিয়া সন্নিহিত কাটোয়ার থেকে দু-কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি অন্যতম বৈষ্ণব শ্রীপাট বা আখড়া হলো জাজিগ্রাম। এই শ্রীপাটটি ছিল পরম বৈষ্ণব ভক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম সঞ্চালক ও প্রচারক শ্রীনিবাস আচার্যের তীর্থকেন্দ্র। বৈষ্ণব সমাজে 'প্রিয়াজী' নামে পরিচিত বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁকে দীক্ষাদান করেছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্যের পৈত্রিক বাসস্থান ছিল নদিয়ার চাকুন্দিগ্রাম। জাজিগ্রাম ছিল শ্রীনিবাস আচার্যের মাতুলালয় ও শ্বশুরালয়। ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীর ও রানি সুলক্ষণাদেবী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এঁরা জাজিগ্রামে একটি মন্দির নির্মাণ এবং একটি দীঘি খনন করে দিয়েছিলেন। **১৯১৭** খ্রিস্টাব্দে উক্ত মন্দির পরিত্যক্ত হলে, মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব নতুন একটি মন্দির তৈরি করে দিয়েছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্র গতিগোবিন্দ মদনগোপাল বিগ্রহ ও শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠা করেন এই মন্দিরে।[১৪] সেই ষোড়শ শতক থেকে শুরু করে আজও একবিংশ শতকে এই মন্দিরে মদনগোপাল বিগ্রহের নৃত্যসেবা অনুষ্ঠিত হয়। বৈষ্ণব সাধক বীরভদ্র গোস্বামী ও নরোত্তম ঠাকুরেরও আসন আছে এই মন্দিরের মধ্যে। প্রতিবছর বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীনিবাস আচার্যের আবির্ভাব উৎসব মহাসমারোহে পালিত হয়ে থাকে জাজিগ্রাম আখড়া বা শ্রীপাটে।

কৃষ্ণপুর আখড়া : হুগলি রেলওয়ে স্টেশনের পশ্চিম দিকে দু-কিলোমিটার দূরে সরস্বতী নদীর তীরে মগরা থানা অবস্থিত। এখানে সপ্তগ্রামের কাছে এক অখ্যাত গ্রাম ছিল কৃষ্ণপুর। এখানকার বহু মানুষ বণিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৫১০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলে গমন করার পথে শান্তিপুর, কাটোয়া, কালনা হয়ে বন্দর সপ্তগ্রামের বণিকদের বসতি এই কৃষ্ণপুরে এসেছিলেন। তৎকালীন বাংলার শাসনকর্তা হোসেন শাহের এই অঞ্চলের রাজস্ব আদায়কারী ছিলেন সপ্তগ্রামের জমিদার গোবর্ধন ও হিরণ্য। এই পরিবারের অন্যতম ছিলেন রঘুনাথ মজুমদার। এঁরা বছরে রাজস্ব বাবদ ১২ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা হোসেন শাহের রাজকোষে জমা করার পরেও অতিরিক্ত ৮ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা আয় করতেন। এঁদেরই পরিবারের একমাত্র পুত্র রঘুনাথ সংসার ত্যাগ করে শ্রীচৈতন্যের সহচর হয়ে নীলাচল যাবার জন্য মনস্থির করে বসেন। কিন্তু মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু নীলাচল থেকে ফিরে বৃন্দাবনে যাবেন এই খবর পেয়ে রঘুনাথ পুনরায় শান্তিপুরে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং সহচর হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব সর্বসাধারণ ভক্তদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য রঘুনাথকে বিরত করার উপদেশ দিয়েছিলেন। এই সময় চব্বিশ পরগনার পানিহাটিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নীলাচলের সহচর রাঘব পন্ডিতের গৃহ 'রাঘব ভবনে' নিত্যানন্দ প্রভুর অবস্থানকালে রঘুনাথ নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা পাওয়ার জন্য পানিহাটি বা পেনেটি যান।[১৫] নিত্যানন্দ প্রভু সংবাদ পেয়ে পরম বৈষ্ণব রঘুনাথকে সমস্ত ভক্তদের চিড়া-দধি ভক্ষণ করানোর আদেশ দিয়েছিলেন। সেই থেকে প্রতিবছর জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমার আগের ত্রয়োদশী তিথিতে খড়দহ থানার পানিহাটিতে গঙ্গা তীরে রাঘব পন্ডিতের রাঘব ভবনে 'দন্ডমহোৎসব' বা চিড়া-দধির মহোৎসব মেলা পালিত হয়ে আসছে। এমত অবস্থায় রঘুনাথ মজুমদার সপ্তগ্রামের কৃষ্ণপুরে ফিরে এলে তাঁর বাবা ও জ্যাঠামশাই একমাত্র সন্তানকে ফিরে পেয়ে সকল গ্রামবাসীকে মাছ ও ভাতের নিমন্ত্রণ করেন। সেই থেকে মগরায় আজও উক্ত উৎসব পালিত হয়ে আসছে। সপ্তগ্রামে জমিদার নন্দন রঘুনাথ দাস গোস্বামী স্থাপন করলেন 'প্রেম প্রতিমা শ্রীকৃষ্ণ' বিগ্রহকে। পরবর্তীকালে ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে এখানে একটি মন্দির তৈরি হয়। এখানকার এই মন্দিরটি আটচালা অপরূপ কারুকার্যময় শৈলীতে নির্মিত। এই মন্দিরে কোন বিগ্রহ নেই। বৈষ্ণব শিরোমণি রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জন্মভিটাও শ্রীপাট এই কৃষ্ণপুর অন্যতম বৈষ্ণব তীর্থ কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত। এই আখড়াতে প্রতিবছর পয়লা মাঘ উত্তরায়ণ মেলা হয়। সরস্বতী নদীর তীরে এই শ্রীপাট আজও অতীতের স্মৃতি বহন করে চলেছে। এই শ্রীপাটের পেছনেই সরস্বতী নদীর তীরে একটি বৃহৎ মাছের মেলা প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

নিত্যানন্দপুর : হুগলি জেলার মগরা থানার অন্তর্গত কুন্তীঘাট রেলওয়ে স্টেশনের পাশেই সপ্তগ্রামের একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম নিত্যানন্দপুর। বৈষ্ণব সাধক, প্রচারক ও সঞ্চালক নিত্যানন্দ প্রভু লীলাক্ষেত্র ও পুণ্য তীর্থ এই নিত্যানন্দপুর শ্রীপাট। এখানেই বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার উদ্ধারণপুর গ্রামে জন্মলাভ করা সুবাহু নামা পঞ্চম গোপাল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর এই শ্রীপাটের নেতৃত্ব দেন। নিত্যানন্দ প্রভুর ডাল বাঁধার কাঁটা থেকে সৃষ্ট ভগবৎ লীলার সার্থক সৃষ্টি 'মাধবীলতা গাছ ও নূপুরকুণ্ড সমন্বিত' শ্রীপাটটি বৈষ্ণব জগতে অসম্ভব জনপ্রিয়। অবিভক্ত বাংলার অত্যাচারিত ও দুর্দশাগ্রস্থ মানুষজনকে বুকে টেনে নিয়ে প্রেম বন্যা উজার করে দিয়েছিলেন নিত্যানন্দ প্রভু এই শ্রীপাটকে কেন্দ্র করে। সমাজের দিশেহারা, অচ্ছুৎ, অসহায় অত্যাচারিত মানুষগুলি নাগপাশ থেকে মুক্তি পায় তাঁর অনুপ্রেরণায়। শ্রীচৈতন্যের নীলাচলের সহচর নিত্যানন্দ প্রভু কালনা হয়ে সপ্তগ্রামের নিত্যানন্দপুরে ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে আসলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। নিত্যানন্দ প্রভুর আখড়াতে মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব উৎসব এবং উদ্ধারণ ঠাকুরের আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে মেলা ও মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

বাঘনাপাড়া : বাঘনাপাড়া শ্রীপাটটিও নদিয়ার সন্নিহিত বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। গঙ্গার এক পাড়ে কালনা অপর পাড়ে শান্তিপুর। গঙ্গা তীরের কালনা থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে বাঘনাপাড়া বৈষ্ণব তীর্থটি অবস্থিত। এটি একটি অন্যতম বৈষ্ণব শ্রীপাট। এই অঞ্চলে একদা বাঘের বাস থাকায় এর নামকরণ হয়েছে বাঘনাপাড়া। এখানে বৃহৎ জঙ্গল কেটে এই বৈষ্ণব আখড়াটি নির্মিত হয়েছিল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকটকালের পূর্বেই এই স্থানটি বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই শ্রীপাটটি প্রতিষ্ঠা করেন অন্যতম বৈষ্ণব সাধক কবিরাজ রামচন্দ্র

গোস্বামী।[১৬] পরবর্তীকালে বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে বাঘনাপাড়া অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের একটি অন্যতম অনুসারী বৈষ্ণব সম্প্রদায় 'বাঘনাপাড়া সম্প্রদায়' বা 'রসরাজ সম্প্রদায়' বিস্তার লাভ করে। এই শাখাটি ছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সমান্তরালে একটি অনুসারী শাখা-সম্প্রদায়। এই বৈষ্ণব সারস্বত কেন্দ্রটি প্রতিটি বৈষ্ণব মহাজন ও পালকের কাছে অবশ্য দর্শনীয় একটি উল্লেখযোগ্য স্থান।

কুলিনগ্রাম : কুলিনগ্রাম আখড়াটি হুগলি জেলার ধনেখালি থানার অন্তর্গত। জৌগ্রাম বা মশা গ্রাম রেলওয়ে স্টেশন থেকে কিছুটা দূরে এই আখড়াটির অবস্থান। ২৪ পরগনার মাহিনগরের বৈষ্ণব সাধক মাহিপতি রামানন্দ বসু কুলিনগ্রামে এসে একদা বসতি স্থাপন করেন। তিনি এই আখড়ার নাম দেন কুলিনগ্রাম। এখানেই রামানন্দ বসুর বাটিতে মহাপ্রভু নীলাচল গমনকালে তিন দিন অতিবাহিত করেছিলেন। এখানে রামানন্দের পৈত্রিক বসতবাটি ও ছিল। রামানন্দ বসু শ্রীচৈতন্যের সাত সম্প্রদায়ের চৌদ্দ মাদল দলের হয়ে নীলাচলে কীর্তন করতেন।[১৬ক] এই আশ্রমে ইটের তৈরি মন্দিরে বৃহৎ অংশ জুড়ে মদনগোপাল, শ্রীরাধিকা ও শ্রীললিতার বিগ্রহ আছে এবং মন্দিরের পূর্বদিকে গোপাল দীঘি নামে একটি দীঘি আছে। কবি মালাধর বসুর জন্মস্থান এই কুলিনগ্রাম অঞ্চল। তিনি সুলতান রুকনুদ্দিন বরবক শাহের (১৪৫৯-৭৪ খ্রিস্টাব্দ) শাসনামলে "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন ১৪৭৩- ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে। গ্রন্থ রচনা শেষ হয় বরবক শাহের পুত্র ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে। সুলতান তাঁকে 'গুণরাজ খাঁ' নামে ভূষিত করেছিলেন। সে কারণে আরও বেশি পরিচিত ছিল এই কুলিনগ্রাম বৈষ্ণব তীর্থকেন্দ্রটি।

বাবলা-শান্তিপুর : বৈষ্ণব ধর্মদর্শন অনুসারে পঞ্চতত্ত্বের অদ্বিতীয় শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের শ্রীপাট বাবলা-শান্তিপুর। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের পীঠস্থান হিসাবে নদিয়া জেলার শান্তিপুর একটি সর্বজন পরিচিত নাম। বৈষ্ণব চূড়ামণি অদ্বৈত আচার্যের সাধনাস্থল এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদধূলি মন্ডিত পবিত্র তীর্থভূমি এই বাবলা-শান্তিপুর শ্রীপাট। শান্তিপুর রেলস্টেশন থেকে এক মাইল দূরে বাবলা নামক স্থানে শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের শ্রীপাট অবস্থিত। অদ্বৈত আচার্যের এই আশ্রমেই শ্রীচৈতন্যদেব অন্তত দু'বার পদার্পণ করেছিলেন বলে জানা যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের 'পঞ্চধামে'র মধ্যে শান্তিপুর অন্যতম একটি জনপ্রিয় ধাম।

শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের (১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দ) অর্ধশতাব্দী পূর্বে অদ্বৈত আচার্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন আনুমানিক ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে। শ্রীহট্ট বা সিলেট জেলার লাউড় পরগনার নবগ্রামে অদ্বৈত আচার্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম শ্রীকুবের তর্কপঞ্চানন এবং মাতার নাম নাভাদেবী। বাল্যকালে অদ্বৈত আচার্যের নাম ছিল কমলাক্ষ। ১২ বছর বয়সে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য শ্রীহট্ট থেকে শান্তিপুরে চলে আসেন এবং সেখানেই বসতি স্থাপন করে থেকে যান। বৈষ্ণবদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চারটি সম্প্রদায়ের মধ্যে মাধবাচার্য সম্প্রদায় অন্যতম। এই সম্প্রদায়ের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা মাধবেন্দ্রপুরী একদিন শান্তিপুরে এলে, কমলাক্ষ এই মাধবেন্দ্রপুরীর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই অঞ্চলের আর একজন বিখ্যাত সাধক ছিলেন যবন হরিদাস। অদ্বৈত আচার্য ও হরিদাস এই দুজনের ভক্তিতে শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণের অবতার হয়েছিলেন বলে বৈষ্ণবগণ মনে প্রানে বিশ্বাস করে থাকেন। শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের বা অপ্রকটের পরও অদ্বৈত আচার্য কয়েক বছর বেঁচে ছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের তিরোধান হয়েছিল আনুমানিক ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে। তবে এটা নিয়ে মতান্তর রয়েছে। অদ্বৈত আচার্যের তিরোধানের পর থেকেই বাবলার এই আশ্রমটি 'অদ্বৈতপাট' নামে খ্যাত হয়। জনশ্রুতি আছে যে, এই বাবলাতেই শান্তমুনি নামে একজন ঋষি বসবাস করতেন। তাঁর নিকট অদ্বৈতপ্রভু ১২/১৩ বছর বয়স পর্যন্ত বেদান্ত ও শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেন। এখানে অদ্বৈতপ্রভু ও হরিদাস ঠাকুর উভয়ে বসে ভগবত প্রসঙ্গে আলোচনা করতেন বলে জানা যায়। পূর্বে এই শ্রীপাটের নিচ দিয়ে গঙ্গাঝ্যঝ্যনদী প্রবাহিত ছিল, তার স্পষ্ট চিহ্ন আজও দেখা যায়। এখন সেই খাত কিছুটা রয়েছে এবং কিছুটা জনসাধারণের চাষযোগ্য জমির সঙ্গে মিশে গেছে। এখানকার মৃত্তিকা খননকালে প্রাচীনকালের মহোৎসবের ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার মৃৎপাত্রদি বার হয়েছিল বলে জানা যায়।

এখানকার মন্দিরে রয়েছে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ। এই আখড়ার একটু দূরে একটি বেদী আছে। সেই বেদীতেই অদ্বৈত আচার্য ও ঠাকুর হরিদাস একসঙ্গে বসে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসার বিষয়ে আলোচনা করতেন।[১৭]

ফুলিয়া : এটি ছিল বৈষ্ণবদের একটি অন্যতম আখড়া। কৃত্তিবাস ওঝার জন্মস্থান এবং শ্রীহরিদাস ঠাকুরের শ্রীপাট ছিল ফুলিয়া। ফুলিয়া নদিয়া জেলার শান্তিপুরের সন্নিকটেই অবস্থিত। ফুলিয়া সুফি হরিদাস ঠাকুরের শ্রীপাট হলেও বাংলা ভাষায় রামায়ণের আদি রচয়িতা কৃত্তিবাস ওঝার জন্মস্থান বলেই সমধিক পরিচিতি লাভ করেছিল। ফুলিয়ার অপর নাম 'ফুল্লবাড়ি'।[১৭ক] শিয়ালদা-শান্তিপুর রেলপথ শাখার রানাঘাট জংশন হয়ে শান্তিপুরগামী লাইনে ফুলিয়া রেলস্টেশন অবস্থিত। এই স্টেশন থেকে মাত্র এক মাইল দূরে বিখ্যাত নামাচার্য হরিদাস ঠাকুরের শ্রীপাটটি অবস্থিত। অদ্বৈত আচার্য শান্তিপুরে থেকে যখন কঠোর তপস্যা করতেন, সেই সময় ফুল্লবাড়ি গ্রাম থেকে ফুল তুলে এনে সেই ফুল দিয়ে পুজো করার পর; সেই ফুল যে স্থানে ফেলতেন সেই স্থানটির নামই ফুলিয়া হয় বলে কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। অদ্বৈত আচার্য ১২ বছর বয়সে পিতা-মাতার সঙ্গে শ্রীহট্ট থেকে শান্তিপুরে এসে ফুল্লবাড়ি গ্রামে শান্ত আচার্যের কাছে অধ্যয়ন শুরু করেছিলেন। এই ফুল্লগ্রামেতেই নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরচন্দ্রের জামাতা পার্বতী মুখার্জির শ্রীপাট অবস্থিত ছিল। কাটোয়াতে সন্ন্যাস গ্রহণের পর নীলাচলে যাবার পথে শ্রীচৈতন্যদেব সর্বপ্রথম ফুলিয়ায় হরিদাস ঠাকুরের আশ্রমে এসেছিলেন। তাঁরই আদেশে জগদানন্দ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত বলরাম, রেবতী, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধিকার বিগ্রহ আজও নিত্য সেবিত হয়ে আসছে। তবে সবই গতানুগতিকতা বজায় রাখার জন্য বহিরঙ্গের অনুষঙ্গ মাত্র। বাইরে দেখানোর জন্য এগুলো করা হয়ে থাকে, অন্যত্র থেকে এর কোন সারবত্তা কৃত্তিবাসের ফুলিয়া, হরিদাস ঠাকুরের ফুলিয়া, শ্রীচৈতন্যদেবের চরণস্পর্শে পবিত্র প্রেমরত্ন ফুলিয়া এবং তারই কাছে উপনগরী ফুলিয়া আজ সকলেরই দ্রষ্টব্য স্থান হলেও ঠাকুর হরিদাসের শ্রীপাট আশ্রম -মন্দির সব যেন আজকের দিনে ম্রিয়মান হয়ে আছে। ম্রিয়মাণ এই কারণে যে, রাজনৈতিক পট্ পরিবর্তন ও সেই সঙ্গে সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে এই আখড়াটি বা আশ্রমটি আর পূর্বাবস্থায় নেই। কৃত্তিবাসের জন্মদিনে প্রতিবছর এখানে উৎসব হয়। ঠাকুর হরিদাসের আবির্ভাব ও তিরোভাব দিবসে কোন অনুষ্ঠান এখানে হয় না। তাই ফুলিয়া বৈষ্ণব শ্রীপাটটি কালের গভীরে হারিয়ে যেতে বসেছে।

যশোড়া : শিয়ালদা-রানাঘাট রেলপথে নদিয়া জেলার চাকদহ রেল স্টেশনে নেমে তিন-চার কিলোমিটার দূরে যশোড়া আখড়া ও মন্দিরটি অবস্থিত। এই শ্রীপাটটি বৈষ্ণব সাধক শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের মন্দির ও আখড়া হিসাবে পরিচিত ছিল। একদা এই মন্দিরের পূর্ব দিকে খুব নিকটেই গঙ্গা নদী প্রবাহিত ছিল। বর্তমানে নদীটি অনেক দূরে সরে গিয়েছে। প্রাচীন গঙ্গাতীরের যে বটবৃক্ষতলে শ্রীজগদীশ পণ্ডিত পুরীধাম থেকে শ্রীশ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ বহন করে আনার সময় বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন, সেই প্রাচীন বটবৃক্ষটি আজও বিদ্যমান আছে। পরবর্তীকালে সিদ্ধ ভগবান দাস বাবাজি ওই বৃক্ষতলে সাধনভোজন করতেন বলে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। সুতরাং, যশোড়া বৈষ্ণব শ্রীপাটটিও বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসে একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য তীর্থক্ষেত্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল।

নবদ্বীপের 'বড় আখড়া' : শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর থেকেই নবদ্বীপ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের কাছে প্রধান তীর্থরূপে পরিগণিত হয়ে আসছে। নবদ্বীপের বৈষ্ণব সাধুদের বিষয়ে যতদূর জানতে পারা গিয়েছে, তাঁদের মধ্যে তোতারাম দাস বাবাজি প্রধান। তাঁর কার্যদক্ষতা, পাণ্ডিত্য ও বৈরাগ্য সে যুগে অতুলনীয় ছিল। শোনা যায়, তিনি দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁর প্রকৃত নাম ছিল রামদাস মিশ্র। তিনি প্রথম যৌবনে ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করার জন্য নবদ্বীপে এসেছিলেন। কিন্তু পাঠ শেষ করার আগেই প্রবল বৈরাগের উদয় হওয়ায় তিনি বৃন্দাবনে চলে যান। সেখানে বহুদিন সাধন-ভজন করার পর স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে মহাপ্রভুর সেবা পর্যবেক্ষণ করার জন্য নবদ্বীপে ফিরে আসেন। রামদাস বাবাজি গিরিধারীর সেবা করতেন। ওই বিগ্রহ তাঁর কাছেই গাছতলাতে থাকত। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে কয়েকবার আলাপের পর মহারাজ তাঁর বিগ্রহের আশ্রম নির্মাণের জন্য ওই গাছতলার পার্শ্ববর্তী ছয় বিঘা নিষ্কর জমি দান করেন। জমির ওপর তোতারাম

দাস আখড়া করে বিগ্রহ সেবা করতেন। এবং সেই আখড়ার নাম 'বড় আখড়া'। উক্ত আখড়া বর্তমানে তোতারাম দাসের উত্তরপুরুষ শিষ্যগণ ভোগ করে আসছে। 'বড় আখড়া'টি বর্তমান নবদ্বীপ পৌরসভার অন্তর্গত গাঙতলা রোডে অবস্থিত।[১৮]

'ছোট আখড়া' : বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যে সকল বৈষ্ণব মহাত্মা আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে চৈতন্যদাস নামক একজন সাধক ছিলেন অন্যতম। তাঁর পূর্বাশ্রম কোথায় ছিল তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও তিনি প্রথম যৌবনে নবদ্বীপে এসেছিলেন। নবদ্বীপ থেকে তিনি কিছুদিনের জন্য বলাগড়ে যান এবং সেখানে গোপীভাবে ভজনা আরম্ভ করেন। বলাগড় থেকে বর্ধমানের শ্রীখন্ডে এবং সেখান থেকে তিনি বৃন্দাবনে চলে যান। বৃন্দাবনেও কিছুকাল সাধন ভজন করেন এবং সেখানেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। চৈতন্যদাস বাবাজি যে আখড়াটি নির্মাণ করেছিলেন সেটি 'ছোট আখড়া' নামে পরিচিত। তিনি নিজেকে 'গৌরাঙ্গের নাগরী' বলে অভিমান করতেন এবং সেই আবেশে নারীবেশ ধারণ করে শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্তির বামপাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন। যতক্ষণ না পর্যন্ত বাহ্যজ্ঞানের উদয় হত, ততক্ষণ তিনি নারীবেশ ত্যাগ করতেন না। এই আখড়ায় শ্রীগৌরাঙ্গের সেবাকার্য তাঁর তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হতো। নবদ্বীপে বসবাস কালে নবদ্বীপবাসী, পন্ডিত মণ্ডলী তাঁর বিনয় ও পান্ডিত্যে আকৃষ্ট হয়ে সকলেই তাঁর সঙ্গে মিশতেন। সে কারণে তিনি 'সিদ্ধ চৈতন্যদাস' নামে খ্যাত ছিলেন।

নবদ্বীপের সিদ্ধ জগন্নাথ বাবাজির মঠ ও আখড়া : জগন্নাথ বাবাজি নবদ্বীপের আর একজন সিদ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন।[১৯] নবদ্বীপের যে সকল বৈষ্ণব মহাত্মা ছিলেন তার মধ্যে সিদ্ধ শব্দটি চৈতন্যদাস বাবাজি এবং জগন্নাথ বাবাজির নামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। জগন্নাথ দাস বাবাজি শৃঙ্গারমঠের গোস্বামীদের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তিনি ব্রত পালনে নিষ্ঠাবান ছিলেন। তিনি একাধিক ক্রমে তিন দিন পর্যন্ত নির্জলা উপবাস করে ব্রত পালন করতেন। জীবনের শেষ লগ্নে তিনি নবদ্বীপে যেখানে ভজন কুটির আছে, সেখানে কলকাতার তাঁর এক ধনী ভক্ত মাধব দত্ত প্রদত্ত দশ কাঠা জমিতে আশ্রম, মন্দির ও মঠ স্থাপন করেছিলেন। এই আখড়াটিও সেকালের একটি অন্যতম বিখ্যাত আখড়া ছিল।

গোবিন্দবাড়ি : মণিপুরী সাধু ভুবনেশ্বর দেববর্মা **১৩৩২** বঙ্গাব্দে নবদ্বীপ বাজারের উত্তর দিকে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-গৌরাঙ্গ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই মন্দিরই সাধারণভাবে 'গোবিন্দবাড়ি' নামে কথিত আছে। এই মন্দিরে প্রত্যহ কৃষ্ণনাম পাঠ ও কীর্তন সম্পন্ন হয়। এছাড়াও নবদ্বীপে বর্তমানে যে ক'টি আখড়া দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলির মধ্যে বেশির ভাগই তোতা রামদাস বাবাজির শিষ্য-প্রশিষ্যরা স্থাপন করেছেন। তোতারাম দাসের শিষ্য রঘুনাথ দাস 'বড় আখড়ার' অধিকারী ছিলেন। তার অপর এক শিষ্য লছমন দাস 'শ্রীবাসাঙ্গন' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[১৯ক]
রঘুনাথ দাসের শিষ্য রতনদাস 'নৃসিংহদেবের আখড়া' স্থাপন করেন। পাশাপাশি গোরাচাঁদ দাস বাবাজি 'গোরাচাঁদের আখড়া', সিদ্ধেশ্বর দাস বাবাজি ,'সিদ্ধেশ্বরের আখড়া' স্থাপন করেছিলেন। লর্ড হেস্টিংসের দেওয়ান কান্দি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বলে পরিচিত গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ শেষ বয়সে নবদ্বীপে এসে বসবাস করেছিলেন। নবদ্বীপের নিকটবর্তী রামচন্দ্রপুরে বাংলা **১১৯৯** সনের (**১৭৯২** খ্রিষ্টাব্দে) **১**লা অগ্রহায়ণ ৬০ ফুট উঁচু সুন্দর এক মন্দির নির্মাণ করে সেই মন্দিরে শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, কৃষ্ণজী এবং মদনমোহনজীর নিত্যসেবা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই মন্দিরটি **১৮৯১** সালে বর্তমান ছিল, কিন্তু তার পরে **১৯২১** খ্রিস্টাব্দে গঙ্গাগর্ভে পতিত হয়। এই সকল আখড়া ও মন্দিরের আজ আর সঠিক সন্ধান পাওয়া যায় না। অনেক মঠ, মন্দির, আখড়া গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। এইভাবে মঠ, মন্দির ও আখড়া যেমন নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে, তেমনি নবদ্বীপের বড়ালঘাটস্থিত কাচকামিনীর মন্দির ও আখড়ার মতো অনেক মন্দির ও আখড়া সাংগঠনিক দুর্বলতার অভাবে ধ্বংস বা বিনষ্ট হয়ে গেছে কালের নিয়মে।[২০]

সমাজবাড়ি : শ্রীশ্রীরাধারমণ চরণ দাস বাবাজি মহোদয় শ্রীবাসাঙ্গনের নিকটবর্তী 'নসিবাবুর' বৈঠকখানা ক্রয় করে **১৩১২** বঙ্গাব্দে একটি মঠ স্থাপন করেন। এই মাঠটিকেই বলা হয় 'সমাজবাড়ি' বা 'শ্রীরাধারমণবাগ'। এখানকার

শ্রীনিতাই-গৌর বিগ্রহ অতি মনোরম। রাধাকান্ত জিউর অষ্টকালীন সেবাকার্য এই মঠের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নৃত্য কীর্তন, নামগান, ভগবদগীতা পাঠ এই মঠের অনন্য সাধারণ আকর্ষণ। শ্রীমন নবদ্বীপ দাস, শ্রীমতি ললিতা দাসী, শ্রীমৎ রামদাস বাবাজি প্রমুখ সাধক-সাধিকা এই মঠের প্রাণ প্রতিষ্ঠা রূপে বিরাজ করেন। ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে রাধারমণদেবের অন্তর্ধান উপলক্ষে এখানে পূর্বে নবরাত্রিব্যাপী নাম-সংকীর্তন মহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু বর্তমানে সে উৎসব অনুষ্ঠিত হলেও পূর্বাপেক্ষা অনেক সংক্ষিপ্ত আকারে হয়ে থাকে।

অমৃত আশ্রম : নদিয়া জেলার প্রাচীন মায়াপুরে গঙ্গার ধারে নির্জন প্রান্তে এক বিঘা পরিমাণ পতিত জমির উপর একটি মঠ, মন্দির ও আখড়া নির্মিত হয়েছে যা 'অমৃত আশ্রম' নামে সর্বাধিক সুখ্যাতি অর্জন করেছে। এই আখড়ায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এক প্রভাবশালী ব্যক্তি এখানে একটি ছোটো মন্দির ও একখানি ছোটো গৃহ নির্মাণ করেন। পূর্বে এই এক বিঘা পরিমাণ পতিত জমিটি জমিদার চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের বংশধর গৌরগোপাল রায়ের অধীনে ছিল। গৌরগোপাল রায়ই এই মন্দির ও আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই প্রাচীন মন্দিরও আশ্রমটি অমৃত আশ্রম নামে গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে সুখ্যাতি প্রসিদ্ধি লাভ করে।

সাধুবাবার আখড়া : ষোড়শ শতাব্দীতে অদ্বৈত আচার্য তাঁর সেবাইত মদনগোপাল বিগ্রহের পুজোর সেবার দায়িত্ব অর্পণ করেন কৃষ্ণমিশ্র নামক এক সাধকের ওপর। পরবর্তীকালে কৃষ্ণমিশ্র আবার সেই বিগ্রহের দায়িত্ব অর্পণ করেন আনন্দগোপাল গোস্বামী ওপর। আনন্দগোপালের তিন পুত্র। কনিষ্ঠ পুত্র নিকুঞ্জগোপাল গোস্বামীর উপর আনন্দগোপাল সেই মদনমোহন বিগ্রহের পূজা ও নিত্য সেবাদির যাবতীয় ভার অর্পণ করেন। অদ্বৈত আচার্যের বংশধর বলে পরিচিত নিকুঞ্জগোপাল গোস্বামী প্রাচীন মায়াপুরে এক বিঘা জমির উপর শিষ্যদের সাহায্য সহযোগিতায় একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এই মঠের অধীনে আরও পাঁচ বিঘা জমিযুক্ত করে ভক্তদের মধ্যে চাষ আবাদের জন্য ভাগ করে দেওয়া হয়। প্রথম থেকে এই আশ্রমটি 'সাধুবাবার আখড়া' নামেই পরিচিত ছিল। বর্তমানে এই প্রাচীন মন্দির ও আখড়াটির সংস্কার সাধিত হয়েছে এবং আখড়াটি সামগ্রিকভাবে পরিচালনা করেন কৃষ্ণদাসী নামক একজন মহিলা। তিনিই এই আখড়ার অধ্যক্ষা এবং সেবাইতসহ সর্বেসর্বা।[২১] এছাড়াও নবদ্বীপে রয়েছে 'বলদেবের আখড়া', বহু প্রাচীন 'কন্থাধারীর আখড়া,'নবদ্বীপের অন্তর্গত প্রাচীন মায়াপুরের মদনমোহন জিউর আখড়া প্রভৃতি।

শ্রীচৈতন্যদেবের দেহত্যাগের পূর্বে মূর্তি নির্মাণ করে গৌরপূজার প্রবর্তন সম্ভবপর হয়নি। কারণ হিসেবে বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রবল নিষেধ ছিল। কিন্তু তাঁর দেহান্তরিত হওয়ার পর নবদ্বীপ, কালনা, কাটোয়া, অগ্রদ্বীপ, শ্রীখন্ড, পানিহাটি, বরানগর, খড়দহ, শান্তিপুর, মুর্শিদাবাদ, খেতুরি, গাম্ভীলা, বাবলা, ফুলিয়া, জাজিগ্রাম প্রভৃতি স্থানে নিত্যানন্দসহ গৌরাঙ্গের মূর্তি নির্মিত ও স্থাপিত হতে থাকে। এই সমস্ত স্থানে আখড়া স্থাপিত হয় নিত্য নিয়মিত পূজা-পার্বণ ও সেবাকৃত্য অনুষ্ঠানের জন্য। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের সময় থেকে এইসব আখড়াগুলি জনপ্রিয়তার শীর্ষে উত্তীর্ণ হয় এবং পরবর্তীকালে নরোত্তম, শ্রীনিবাস আচার্য ও শ্যামানন্দের আবির্ভাব ও বৈষ্ণবধর্ম প্রচারকালে সারা বাংলায় বহু গ্রামাঞ্চলে এবং মফ:স্বল অঞ্চলে বিভিন্ন মন্দির, আশ্রম এবং আখড়া গড়ে উঠতে থাকে। অনুমান করা যেতে পারে যে, এই আখড়াগুলি ভক্তিধর্ম প্রচারের কেন্দ্র রূপে শতাধিক বৎসর সগৌরবে পরিচালিত হওয়ার পর থেকে বৈষ্ণব ভাবুকতা এবং সেইসঙ্গে সংকীর্তন ও মহোৎসবাদি স্থিমিত হয়ে আসতে আসতে গোস্বামী, পূজারী, সেবাইতদের অর্থ উপার্জন ও ভোগবাদী স্বার্থসিদ্ধির জন্য আখড়াগুলি ব্যভিচারের মূল কেন্দ্রে পরিণত হতে থাকে। এর পাশাপাশি সহজিয়া ধর্মসম্প্রদায়ের প্রেমলীলা আর তার প্রাধান্যের চাপে বিকৃত হয়ে পড়ে তৎকালীন ধর্মচর্চার কেন্দ্র আখড়াগুলি। এর ফলে বৈষ্ণবধর্ম জগতে ও সমাজ জীবনে অবক্ষয়ের সূত্রপাত হয়। এবং শুরু হয়ে যায় কেন্দ্রীয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যন্তরে দলাদলি, রেষারেষি, বিরোধ এবং সংঘাত। তাসত্ত্বেও বলতে হয় যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম তথা ভারতীয় বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম প্রাণশক্তি ছিল বিভিন্ন নেতাদের প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব মঠ, মন্দির ও আখড়াগুলি।

তথ্যসূত্র :

১. বিশ্বাস, মোহনকালী, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অবক্ষয়ের কারণ:সাংগঠনিক দুর্বলতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ২০১৭, পৃ. ১১৮

২. তদেব, পৃ. ১২০

৩. বিদ্যাবিনোদ, রজনীকান্ত, শ্রীমহেশ পন্ডিত ও পালপাড়া, সাধক, ২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, পৌষ, ১৩২১, পৃ. ২৬৯-২৭২

৪. দাস, শ্রীহরিদাস (সঙ্কলিত), শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, ১ম, ২য়, ৩য় খন্ড একত্রে, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ১লা বৈশাখ, ১৪২১ সন, পৃ. ১৮২২

৫. তদেব, পৃ. ১৯৮১

৬. চক্রবর্তী, রমাকান্ত, বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬, ৫ম মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ.১৬০; যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, চৈতন্য সংস্কৃতিতে কীর্তনের ভূমিকা, নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, নবদ্বীপ, নদীয়া, পরিবেশক: পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১ম প্রকাশ,২০১৫, পৃ. ৪৫-৪৮

৭. বিশ্বাস, মোহনকালী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩-১৬৮

৮. শ্রী শ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, পৃ. ১৮৫২-১৮৫৪

৯. চক্রবর্তী, রমাকান্ত, বাঙালির ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি, সুবর্ণরেখা পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ২০০২, পৃ. ৬৯-৭০, ৭৩

১০. দাস, শ্রীহরিদাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৬৮

১১. তদেব, পৃ. ১৮৫৯

১২. তদেব, পৃ. ১৮৯৫, ১৯১৯

১৩. বিশ্বাস, মোহনকালী, পূর্বোক্ত

১৪. ভট্টাচার্য, ষষ্ঠীচরণ, বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পাটবাড়ী, পুনশ্চ, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৪৫-১৪৭

১৫. শ্রী শ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, পৃ. ১৮৪৮

১৬. শ্রীলাল, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শ্রীপাটের কথা, আর্যদর্শন, কার্তিক, ১২৮৪, পৃ. ৭-৯; কাননবিহারী গোস্বামী, বাঘনাপাড়া সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব সাহিত্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩, পৃ. ৩, ১৬, ৮০-৮২

১৬.ক. শ্রী শ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, পৃ. ১৮৪৫

১৭. মল্লিক, কুমুদনাথ, নদিয়ার উনিশ শতকের বৈষ্ণব শ্রীপাট, নদীয়া কাহিনী, রানাঘাট, নদীয়া, ১ম প্রকাশ, ১৩১৭, পৃ. ২৫৪-২৫৫; শ্রী শ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, পৃ. ১৯৫০, ১৯৬৪

১৭.ক. তদেব, পৃ. ১৮৯৬

১৮. বিশ্বাস, মোহনকালী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৭-১৯৯

১৯. রায়, মহেন্দ্রচন্দ্র, বঙ্গদেশের তীর্থ বিবরণ ও সাধুজীবন, গ্রন্থকার, কলকাতা, ১৩২০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৪-১৭

১৯.ক. দাস, শ্রীহরিদাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯৭

২০. রাঢ়ী, কান্তিচন্দ্র, নবদ্বীপ-মহিমা, যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী (সম্পা.), নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, নবদ্বীপ, নদীয়া, পরিবেশক: পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ১২৯১, ২য় সং, ১৩৪৪, পরিবর্ধিত সং, ২০১১, পৃ. ১৬৪-১৬৯

২১. দাস, শ্রীহরিদাস, প্রাগুক্ত, বিশেষ দ্রষ্টব্য : শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব আভিধান, পৃ. ১৮২৩, ১৮৪৫, ১৮৫৫, ১৮৯৯, ১৯১৫, ১৯১৩, ১৯২৫, ১৯২৭, ১৯৩২, ১৯৪৫, ১৯৪৭-৪৮, ১৯৪৯ ১৯৫৭, ১৯৬৯